আজকের কাগজ
০৪ ১৫
তারিখ 29 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অরক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার যে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, সম্প্রতি সে-কমিটি তার রিপোর্ট জমা দিয়েছে। আমাদের দেশে যেখানে পাঁচ-দশ সদস্যের বহু তদন্ত কমিটি দীর্ঘদিন পর আদৌ প্রাথমিক তদন্ত কাজটিও সমাধা করতে সক্ষম হয় না, রিপোর্ট দেয়া তো দূরের কথা, সেখানে এই এক সদস্য বিশিষ্ট দলের সাফল্য নিশ্চয় প্রশংসনীয়। এরপর থেকে সদাশয় সরকারের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, যখনই জনস্বার্থে কোনো তদন্ত কমিটি নিয়োগের প্রশ্ন আসবে, সে-কমিটিতে যেন একজনের বেশী সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। তাতে একদিকে অনেক বেশী সংখ্যক কমিটি যেমন গঠন করা যাবে, ত্বরিৎ গতিতে যাবতীয় রিপোর্ট ও তেমনি পাওয়া যাবে। তদন্ত কমিটি শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থাকে, এরূপ একটি দুর্নামও আমাদের ঘুচে যাবে। বর্তমান সরকারের মাত্র কয়েকমাসের কার্যকালে অন্ততঃ তিনটি তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে- এটি একটি বিরল সাফল্য সন্দেহ নেই; এবং আমার বিশ্বাস, কমিটিগুলি আরো ছোটো হলে, তথা এক সদস্যবিশিষ্ট হলে, ফলাফল আরো শীঘ্র পাওয়া যেত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা উঠেছে। ছাত্রদের একটি অংশ বলছে, রিপোর্টটি পক্ষপাতদুষ্ট, ঐ এক-সদস্য বিশিষ্টতার বিষয়টিকে তারা আক্রমণ করেছে। ছাত্ররা অবশ্য ভুলে গেছে যে আমাদের দেশে বিচারকার্য সাধারণতঃ এক-সদস্যবিশিষ্ট আদালতই করে থাকে- একেবারে উচ্চ আদালত ছাড়া-এবং সেখানে যারা সাজা পেয়ে বিচারকার্য সম্পর্কে নানা সন্দেহ পোষণ করেন তাদের খুব সামান্য অংশই উচ্চতর আদালতে যেতে পারেন। বিচারক যদি এজলাসে বসে এক সদস্যবিশিষ্ট

দেখতে পাচ্ছি, ছাত্রদের ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা, বাইরের কোনো রাজনৈতিক দল, মৌলবাদী কোনো সংগঠন অথবা স্বার্থান্বেষী কোনো মহল নয়। শিক্ষকরা দলাদলি করছেন, আর ছাত্ররা বন্দুক, রামদা, চাকু ও হকিস্টিক দিয়ে একে অপরকে মারছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা রাজত্ব করে, কাদের দাপটে এর নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে, এসব খবর তো দশ বছরের বালকটিও জানে।

বিচার সভা পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার মত সামান্য বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব তিনি কেন প্রদর্শন করবেন?

ঐ রিপোর্টটির একটি অতি-সংক্ষেপিত সারাংশ আমি পত্রিকায় পড়েছি। 'আজকের কাগজ' সহ দেশের সকল প্রধান কাগজে এই রকম একটি শিরোনাম ছিল যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার জন্য শিক্ষকদের দলাদলিই দায়ী, এবং উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি জন্ম দিয়েছে সন্ত্রাসের। রিপোর্টে এ রকম একটি সুপারিশ রয়েছে যে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের পরিবর্তন আবশ্যক।

যেহেতু রিপোর্টটি সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার মত। আমি আন্দাজ করে নিই এতে বহু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ আছে। এটি এখনো আমি হাতে পাইনি, এজন্য এর বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো মন্তব্য করা অনুচিৎ হবে। কিন্তু সংবাদপত্রে যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়েছে, সেটি আরেকবার অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করব এই লেখায়।

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িনি বা সেখানে শিক্ষকতাও করিনি। কিন্তু দেশের আর দশজন সচেতন মানুষের মত আমিও উদ্বিগ্ন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছর ধরে কি ঘটছে তা নিয়ে। আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন যারা সেখানে শিক্ষকতা করেন, তাদের কাছ থেকে মাঝে-মধ্যে কিছু সংবাদ পাই এবং এসব থেকে উদ্বিগ্ন হওয়ার মত অনেক বিষয় বেড়িয়ে আসে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মত অতটা পরিষ্কার না হলেও কিছুটা ধারণা আমারও জন্মেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরন্তর সংঘাত ও সন্ত্রাসের কারণ সম্পর্কে। এখন দেখতে পাচ্ছি, সে সব ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে আমাকে। দেখতে পাচ্ছি, ছাত্রদের ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা, বাইরের কোনো রাজনৈতিক দল, মৌলবাদী কোনো সংগঠন অথবা স্বার্থান্বেষী কোনো মহল নয়। শিক্ষকরা দলাদলি করছেন, আর ছাত্ররা বন্দুক, রামদা, চাকু ও হকিস্টিক দিয়ে একে অপরকে মারছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা রাজত্ব করে, কাদের দাপটে এর নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে, এসব খবর তো দশ বছরের বালকটিও জানে। কিন্তু তাদের কোনো উল্লেখ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে নেই। একসদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির দীর্ঘ রিপোর্টে নিশ্চয়ই এসব লিপিবদ্ধ আছে, নিশ্চয় সন্ত্রাসী কারা, কারা তাদের মুরুব্বী, কারা যোগান দেয় অস্ত্র, কিভাবে সে সব ব্যবহৃত হয়, এসব তথ্য সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, তা নাহলে এটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হবে কিভাবে? অথচ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে সব দোষ এখন শিক্ষকদের। শিক্ষকরা যে দলাদলি করেন না, তা নিশ্চয় নয়। এখন ঐ দশ বছরের বালকটিও তাদের দলাদলির কথা জেনে ফেলেছে। কিন্তু তাদের দলাদলির জন্য সন্ত্রাস হচ্ছে এই তথ্যটি আমার কাছে নতুন এবং মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে, এখন এটি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এবং নিশ্চয় আমাদের আরো বিশ্বাস করতে হবে যে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষকরা দলাদলি করে থাকেন, সেখানেও সন্ত্রাসের জন্য শিক্ষিকরা দায়ী। এই রিপোর্টের প্রতিবেদন পড়ে হঠাৎ করে আমার মনে হল, যেহেতু আমি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে তিনটি দল বর্তমান এবং দল থাকলেই দলাদলি যেহেতু থাকে, সেজন্য ঐ দলাদলির অপকর্মটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কমবেশী করে থাকেন- সেহেতু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের উৎপত্তির সঙ্গে এই অধমও জড়িত। এরূপ চিন্তা আমাকে এদেশের আদালতে নিয়ে যেতে পারে, এবং আমি আমার এক হাজার সহকর্মীর মত সেলিম, দেলোয়ার, বসুনিয়া, মুন্না, মাহবুবসহ বহু ছাত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী সাব্যস্ত হতে পারি। আপাততঃ অবশ্য আমরা রেহাই পেয়ে যাব, কারণ তদন্ত কমিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু আমার বন্ধুরা যারা যেখানে শিক্ষকতা করেন, তাদের জন্য আমার বিশেষ করুণা হয়, কারণ এখন তদন্তে ধরা পড়েছে যে নানা খুন জখম ও রাহাজানির ঘটনার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। নিশ্চয়ই যে কোনো সময় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যেতে পারে। তারা সবাই, আইনের ভাষায়, Accessory to murder. তদন্ত কমিটিসমূহের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে বলে আমি নিশ্চিত যে, এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটির রিপোর্টে দলাদলি কর্মে নিয়োজিত শিক্ষকদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ যেন না ভাবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে তিনি পার পেয়ে যাবেন। এতদিন তাদের দলাদলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র আঙ্গিনাটিকে কলুষিত করে রেখেছিল। এখন, এই কমিটি-রিপোর্ট বেরুবার পর যদি সেই দলাদলি বন্ধ হয়! স্বস্তি ফিরে আসে ক্যাম্পাসে। কোমলমতি ছাত্ররা এবার তাদের মারণাস্ত্র ফেরত দিয়ে পুস্তকে এবং শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাবে, সে মারণাস্ত্র তারা অনেক পরিশ্রমে, শিক্ষকদের দলাদলিতে অতিষ্ঠ হয়ে সংগ্রহ করেছিল, সম্ভবতঃ দলাদলিরত শিক্ষকদের কাছ থেকেই। এর আগে অবশ্য আরো দুটি বিষয় ফয়সালা করতে হবে। এর একটি হচ্ছে, উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন। অন্যটি ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের যুগোপযোগী সংস্কার। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি, অথবা একদিন প্রাতঃকালে উঠে এর প্রনেতারা কোনো আদর্শগত বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এটি রচনা করেননি। এর পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুবার পর যখন আমার সামনে অনেক সম্ভাবনা ছিল, তার শ্রেষ্ঠতম আমি বিবেচনা করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ এবং তার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশটিতে মুক্তবুদ্ধি চর্চার যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তার আকর্ষণ ছিল প্রধান। ষোল সতেরো বছর পর দেখা যাচ্ছে, এই অধ্যাদেশের অনেকখানিই আদর্শের পরিধিতে রয়ে গেছে, ব্যক্তির লোভ, উচ্চাভিলাষ এবং কূটনীতি বড় হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের চাইতে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, এই অধ্যাদেশ সম্পর্কে যে, এর আদর্শিক দিকটি প্রশ্নাতীতভাবে প্রশংসনীয়, অন্যত্র অনুকরণযোগ্যও; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, প্রয়োজন হলে পরিবর্তন/ পরিবর্ধন / পরিমার্জনাও সম্ভব। কিন্তু আমার একটি সন্দেহ এই যে, এই অত্যন্ত গণতন্ত্রী এবং গণমুখী অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ মহল অত্যন্ত তৎপর, তারা এর আমুল পরিবর্তন, প্রয়োজন হলে তাকে বাতিল করতে চায়। তারা পাকিস্তানের সময়ের উপাচার্য নিয়োগের আইয়ুব মোনেম পদ্ধতিতে ফিরে যেতে চায়। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা নিজামী লাঞ্ছিত হলে ঐ মহলটি এরূপ মন্তব্যও করে যে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দায়ী এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এরশাদ আমলে তার বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর একবার সংসদে এরূপ একটি অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, এবং এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নানা ফুল, হাফ ও কোয়ার্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী করার ব্যবস্থা করা হবে। ঐ সরকারের অনেক মহৎ উদ্যোগের মত এটিরও কোনো সুরাহা হয়নি।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে যে একটি সংবিধান রচিত হয়েছিল, তার মত উন্নত, চমৎকার ও আদর্শিক দলিল তৃতীয় বিশ্বের খুব কম রাষ্ট্রেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু দু' বছর সময়ও অতিবাহিত হয়নি, দলিলটি কর্তিত, ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দ্বাদশ সংশোধনী পাস হলে হয়তো কিছুটা তার লুপ্ত অবয়ব সে ফিরে পাবে। কিন্তু চিরস্থায়ী দু'একটি অঙ্গহানি তার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, বলা যায় তার অপূর্ব সুন্দর দেহশ্রী আর সে ফিরে পাবে না। দ্বাদশ সংশোধনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে, যে সংবিধানে সমস্যা ছিল না, ছিল যারা এর প্রয়োগের দায়িত্বে আছেন তাদের মানসিকতায়। তারা যদি স্বৈরাচারী হন, পাকিস্তানী অতীতের নস্টালজিয়ায় আপ্লুত থাকেন, ভন্ড ও লম্পট এবং দুর্নীতিবাজ হন, তাহলে একটা সৌন্দর্য, শক্তি এবং বৈভব নিয়েও একটি শ্রেষ্ঠ দলিল অসহায় থেকে যায়। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ তেমনি একটি দলিল, কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের এর অঙ্গহানী এখনো হয়নি, যদিও হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, পরোক্ষভাবে প্রচুর হয়েছেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ হয়েছে বহুবার বহুভাবে। যে মহলটি দেশের সংবিধানকে সহ্য করতে পারে না, তারা এই অধ্যাদেশকেও সহ্য করবে না। এ যদি চালু থাকে, তবে স্বৈরাচারের জন্য পরিণামটি শুভ হবে না। যারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চাকে শৈশবাবস্থায় মেরে ফেলতে চান, তারা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়কে নুলো করে দেবেন, পারলে সরকারী কলেজে পরিণত করবেন, অথবা সশস্ত্র ক্যাম্পে, যাতে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা লুপ্ত হয়, চাকুরী বাচানোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শিক্ষককুল ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকেন, অথবা মোনেম খান নিযুক্ত উপাচার্যের সঙ্গে যেরকম তোয়াজের সম্পর্ক রাখতেন কেউ কেউ সেরকম তোয়াজের সম্পর্ক সকলেই রাখেন। উপাচার্য নিয়োগের পদ্ধতি সংশোধিত হতে পারে যদি তা গণতান্ত্রিক হয় গণতান্ত্রিক যে কোনো পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু উপর থেকে একজনকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তেমন সরকার নিযুক্ত উপাচার্য হাল ধরে থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩৭ জন শিক্ষক ও চারশ'র মত ছাত্র সমৃদ্ধ কোয়ার্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তুলকালাম কান্ড ঘটে গেল তার বিবরণ তো আমরা খবরের কাগজেই দেখেছি। সরকার শেষ মেষ আরেকজন উপাচার্য নিয়োগ করলেন। এখন দেখা যাচ্ছে তাতেও শেষরক্ষা হচ্ছে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে কিনা আমি জানি না। তবে হয়ে থাকলে (এক সদস্য বিশিষ্ট হলে খুব দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া যেত) তার